দয়াল বন্ধুর মন্দির দর্শন

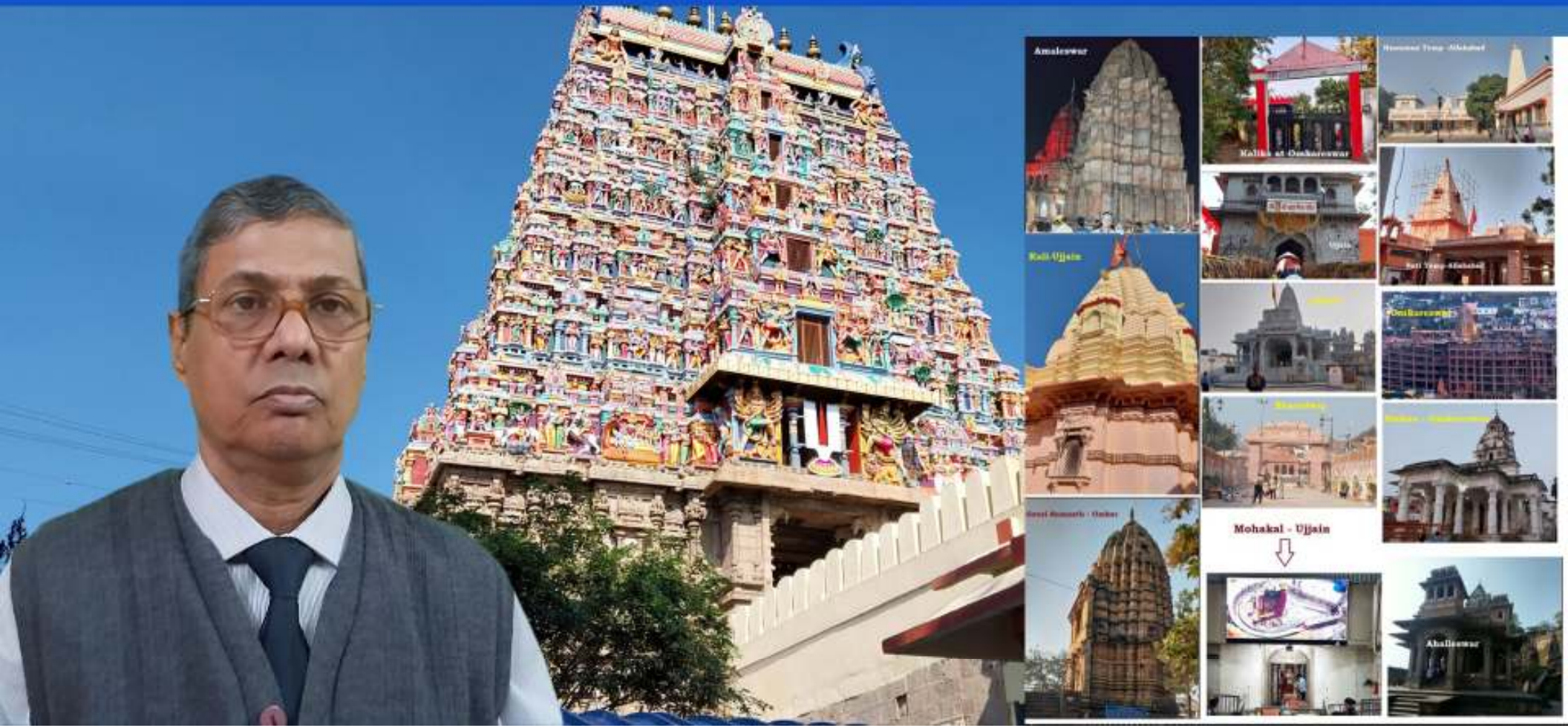

মন্দির দর্শন

পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত চাকরী করে গত বছর অবসর নিয়েছি। এই এক বছরে দেশের মধ্যে গোটা আটেক ট্যুর বা ভ্রমণ হল। এই বিশাল দেশে এরকম বেড়ানোর জায়গা কয়েক হাজার আছে। মোটামুটি প্রচলিত জায়গাগুলি দেখতে হলেও, আমার আরও বছর কুড়ি লাগবে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ বয়স পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানোর মত সুস্থ শরীর থাকার কথা নয়। তারপর তো কথা হচ্ছে, ঐ পঁচাশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেই থাকবো না হয়তো। তাই , আপাতত বছরে আট দশবার ভ্রমণে বেরোব, এরকমই চিন্তা করে রেখেছি।

গত এক বছর তো শুধু নয়, আগেও বহু জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। বেড়ানোর জায়গা বললে, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল আর মন্দির এই চার রকমের বলা যায়। বাঙালির সহজ পাহাড় হল দার্জিলিং । সে তো অনেকদিন আগেই দেখেছি। এছাড়া সিকিমের পাহাড়ও ঘোরা হয়েছে। মধ্য ভারতের কিছু পাহাড় আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ঘুরেছি। আজ মনে হল, মন্দির কি কি দেখা হল তার একটা হিসেব করে দেখি।

আজন্ম দেখে আসছি আমাদের গ্রামের মন্দির। মেদিনীপুরের ত্রিলোচনপুর গ্রামের শীতলা মন্দির। প্রতিদিনই পূজা হয়। শনি মঙ্গলবার বড় তিথি। ছোটবেলায় দেখেছি, এক এক শনিবারে চার-ছয়টা পাঁঠা বলি হয়েছে। দোলের সাতদিনের মাথায় বিরাট উৎসব হয়।

তালন্দ মাতা মন্দির

ছোট বেলায় কলকাতায় বেড়াতে এসে মানিকতলার কাছে পরেশনাথের মন্দির দেখতে গেছলাম। গত কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে কাউকে আর সেই মন্দিরে বেড়াতে যেতে দেখিনি। কলেজে পড়ার সময় বাঁকুড়া থেকে বিষ্ণুপুর গিয়ে ওখানকার টেরাকোটার মন্দিরগুলি দেখেছি। জানতাম ওগুলি বেশ বিখ্যাত; কিন্তু আমার তেমন বিরাট কিছু মনে হয়নি। ওখানে কোন টেরাকোটার মন্দিরে কোন বিগ্রহ দেখিনি। কলেজ থেকে দিল্লিতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে সেখান থেকে একবার হরিদ্বার হৃষিকেশ ঘুরে এসেছিলাম। ভোরবেলা হৃষিকেশ পৌঁছে একজন গাইডের পিছন পিছন ঘুরেছিলাম। সেরকম কোন মনে রাখার মতো মন্দির দেখিনি। গঙ্গা নদী আর তার উপরে

লছমনঝুলা ব্রীজ কিছুটা দেখার মত মনে হয়েছিল। হরিদ্বারে কোন মন্দিরেই সেবার যাওয়া হয় নি। পরে একবার সপরিবারে হরিদ্বারে গিয়ে অনেক মন্দির আর আশ্রম দেখেছিলাম।

বাংলার এক বিখ্যাত শিব মন্দির দেখেছিলাম আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। এক চোখের অপারেশন শিবিরে থেকে গেলাম দিন পাঁচেকের জন্য। বিকেলের দিকে তেমন কোন কাজ থাকত না। আর একটি ছেলে জুটে গেল। দু'জনে চলে গেলাম তারকেশ্বর মন্দির দেখতে। খুবই সাদামাটা একটি মন্দির। আমাদের গ্রামের মন্দির ওর থেকে বড় হবে। যাত্রী আমরা দুই জনই। সাধারণ একটি শিব লিংগ দেখে বিশেষ কিছু মনে হয়নি। ঐ রকম আর এক শিবিরে গিয়ে দেখলাম, নদিয়া জেলার শিবনিবাসের মন্দির। এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখিনি।

সবাই পুরী যায়, জগন্নাথ মন্দির দেখতে। আমরাও সপরিবারে গেলাম একবার। সন্ধ্যা বেলা একজন লোক মন্দিরের গা বেয়ে উঠে, মন্দিরের চুড়ায় পতাকা পাল্টে দিল। তেমন দর্শক কিছু ছিল না। পরদিন সকালে পাণ্ডার সাথে পূজা দিতে গিয়ে দেখলাম, বেশ ভিড়। একদিন সকলে একটা গাড়ী নিয়ে চললাম ভুবনেশ্বর শহর দেখতে। সেখানে কালো পাথরের লিঙ্গরাজ মন্দির দেখলাম। তার অন্তত কুড়ি বছর পর আবার গেলাম ভুবনেশ্বর। সন্ধ্যাটা খালি ছিল। একটি সরকারী গাড়ী পেয়েছিলাম। সাথের ছেলেটি বলল, চলুন লিঙ্গরাজ মন্দির দেখে আসবেন। তাকে বললাম, ও মন্দির আমি দেখেছি, তার চেয়ে বরং চল অচ্যুত সামন্ত বাবুর ইউনিভার্সিটি দেখে আসি। যারা ভুবনেশ্বর যাবেন; সুযোগ পেলে এটি দেখে আসবেন। সেবারই পুরী থেকে কোনারকে গিয়ে বিখ্যাত সূর্য মন্দির দেখেছিলাম।

ধৌলগিরী মন্দির

কোনারক মন্দির

বেশ প্রাচীন মন্দির, আর বেশ বড়। আর দেখেছিলাম একটি শ্বেত শুভ্র বুদ্ধ মন্দির; ধৌলাগিরি বা ধবল গিরি মন্দির।বিশাখাপত্তনম বেড়াতে গিয়ে শহরের বাইরে, পাহাড়ের উপর একটা বড় মন্দির দেখতে গেলাম। আগে ঐ মন্দিরের নাম শুনিনি। ওখানে গিয়ে জানলাম, সিমাচলম মন্দির। মন্দিরে ঢোকার স্টিলের বেড়া ইত্যাদী দেখে বুঝলাম, এক এক সময় বেশ ভিড় হয়। আমরা কিন্তু বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় দেখে এলাম। অনেক বছর আগে দিল্লী বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলাম, লোটাস টেম্পল। পরে কয়েকবার দিল্লি গেলেও মন্দির দেখার মত সময় ছিল না।

সিমাচলমের নৃসিঙ্ঘ মন্দির

সাপের কামড় নিয়ে কাজ করা শুরু করার পর গোটা রাজ্যেই ঘুরে বেড়িয়েছি। কয়েকটা জেলায় গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত মন্দিরও দেখেছি। প্রথমবার কুচবিহারে গিয়ে দেখলাম, মদনমোহন মন্দির। বেশ বিখ্যাত কিন্তু মন্দির তেমন দর্শনীয় নয়। ওখান থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার রাস্তায় পড়ে একটি বিখ্যাত শিব মন্দির; বানেশ্বরা নেমে মিনিট দশেক সময় থাকলাম। খুবই সাধারণ মন্দির। মন্দিরের পুকুরে বেশ কিছু বড় বড় কচ্ছপ আছে। লোকজন ঘাটের কাছে গেলে ওরা

মদনমোহন মন্দির

এগিয়ে আসে। পরে একবার তুফানগঞ্জে গিয়ে একটি স্থানীয় ছেলের সাথে গেলাম, চেংমারী বর্ডার দেখতে। একজন সৈনিকের সাথে, কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে অন্য পারে গেলাম; এটাই বেশ রোমাঞ্চকর। বেড়ার ঐ পারে আছে একটি মনসা মন্দির; ওরা বলল, চাঁদ সওদাগরের মন্দির। নতুন মন্দির, দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পূজাপাঠ কিছু হয় বলে মনে হল না।

মনসা মন্দির

এই সাপের কামড় এর কাজ করতে গিয়েই দেখা হল, বর্ধমানের একশ আট শিব মন্দির। মন্দিরগুলি খুব একটা বড় নয়, কিন্তু একটা বড় ঝিলের চার পাড়ে সুন্দর করে সাজানো। এখনও সবকটি মন্দিরে পূজা হয়।

এছাড়া বর্ধমান শহরের মধ্যে বুড়ো শিবের মন্দির আছে। আর বোধহয় একটি সর্বমঙ্গলা মন্দিরও দেখেছি। এরকম একশ আট বা ঐ রকম অনেক অনেক শিবের মন্দির আছে বর্ধমানের কালনায়। সাপের ক্লাশ নিতে কালনা গেলেও সেই সব মন্দির দেখা হয়নি। কাটোয়া শহরেও বার দুই যেতে হয়েছে , এরকম সাপের কামড় এর ক্লাশ নিতে। একবার একদল শিক্ষকের সাথে গেলাম , কাটোয়া থেকে একটু ভেতরে সিঙ্গি গ্রামে। এই গ্রামে জন্মেছিলেন কবি কাশীরাম দাস। একটি সাধারণ আবক্ষ মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। ওর পাশের গ্রাম শ্রীপুরে বেশ কয়েকটি পুরনো মন্দির আছে। মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার কাজ এখনও দেখা যায়। এই বাংলার মন্দিরের শহর বলা যায় নবদ্বীপকে। অনেক ছোট ছোট মন্দির, তার থেকেও বেশি আশ্রম আছে। স্টেশনে নেমে

একটা রিক্সা নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, অনেক মঠ মন্দির। নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে অন্য পারে মায়াপুর। এখানে তো অসংখ্য মন্দির। সবথেকে বিখ্যাত ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দির। এই মন্দিরটি কিন্তু একটি একতলা নাট মন্দির মত ছিল। সে সময় ওখানে সবথেকে বড় মন্দির ছিল প্রভুপাদ সমাধী মন্দির। পরে একটি বিশাল বড় মন্দির তৈরি হচ্ছে দেখেছিলাম; এখনও নির্মাণ সম্পূর্ন হয়েছে কি না জানি না।

নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

নবদ্বীপের কয়েক ষ্টেশন পরে পূর্বস্থলী। ওখানে নেমে অটো রিক্সা নিয়ে চুপী গেলাম। চুপিতে নৌকা করে মজা ভাগীরথীর খাঁড়িতে ঘুরলাম। দুপুরে স্টেশনের অন্য পারে নিয়ে গেল টোটো। বেশ কিছুটা বাগান গাছপালার ভেতর দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম একটি আশ্রমের গেটে। নাম দেখলাম, কপিল কুটির। বেশ বড় আশ্রম।

কপিল কুটির

পরে ইউটিউবে এরকম বহু মঠ আশ্রমের খবর দেখেছি; কোথাও যাওয়া হয়নি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের উপন্যাস পড়ে জেনেছিলাম, বহরমপুরে শহরের একটু বাইরে একটি বিখ্যাত কালী মন্দির আছে। পরে ওখানকার এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে জানলাম, ওটার নাম বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি। নরেন ক্ষ্যাপা নামের এক বড় সাধক ওখানে থাকতেন। এক ডাক্তার দাদার গাড়ী করে গিয়ে একবার দেখে এলাম।

বিষনুপুর কালীবাড়ী

সাপের কামড় এর কাজ করতেই প্রথম আসামে গেলাম। দুপুরে কাজ সেরে গৌহাটি এয়ারপোর্টে ফেরার রাস্তায় দেখে এলাম বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দির। সেদিন মন্দির চত্বরে দুই চারজনের বেশী লোক দেখিনি। কিন্তু কয়েক বছর পর একটি বড় দলের সাথে গিয়ে দেখি বিশাল ভিড়। আমাদের দলের সকলে ভোরে লাইনে দাঁড়িয়ে বিকেলের পরে পূজা দিয়ে ফিরেছিল। আমি লাইন ছেড়ে একা একাই ভুবনেশ্বরী মন্দির আর উমানন্দ দেখে এসেছি। এবারই সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ আশ্রম আর দুই একটা নতুন মন্দিরও দেখেছিলাম।

সাগরের কপিল মুনি মন্দির

কামাক্ষা মন্দির

ভুবনেশ্বরী মন্দির

ঐ দলের সাথেই কাজিরাঙ্গা যাওয়ার সময় মাঝপথে একটা বিশাল শিব লিঙ্গের মত দেখতে মন্দির দেখে গেলাম। নাম বলল, মহা মৃত্যুঞ্জয় jমন্দির। শিলং শহরের যে পাড়ায় আমরা দুই রাত ছিলাম, সেখানেও একটা কালী মন্দির ছিল।

সাপের কামড় নিয়ে একটা কর্মশালায় যোগ দিতে ভেলোরের বিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজে গেলাম। ওদের কলেজ থেকে হাস্পাতাল পাঁচ কিমি মত দূরে। এক বিকেলে আমরা পাঁচজন একটা গাড়ী নিয়ে ওদের হাস্পাতাল দেখতে চললাম। গাড়ীতে উঠে একজন বললেন, ভেলোরের স্বর্ণ মন্দির বিখ্যাত, চলুন ওটা দেখে যাই। দুপুর তিনটে নাগাদ পৌঁছলাম। মাথাপিছু আড়াইশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। একটা বিশাল বড় প্রান্তরের চারদিকে প্রায় এক কিমি হেঁটে মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। পিতলের বিষ্ণু মূর্তি মনে হল। কিন্তু বেরোনোর রাস্তার পাশে একজন সৌম্য দর্শন মনুষের ছবি বিক্রী হচ্ছে দেখলাম। পুরুষ মানুষ, কিন্তু কি যেন একটা আম্মা বলে নাম, এটুকু মনে আছে।

প্রথমবার মধ্যপ্রদেশ বেড়াতে গিয়ে জব্বলপুরকে কেন্দ্র করে ঘুরেছিলাম। ওখানকার নর্মদা নদীর ধুঁয়াধারা জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার সময় আমাদের ড্রাইভার বড় রাস্তা ছেড়ে ছোলা গমের মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে কয়েক কিমি ঢুকে একটি দেবী মন্দিরে নিয়ে গেল। সাধারণ মন্দির, কিন্তু বেড়ার গায়ে গায়ে হাজার হাজার নারকেল বাঁধা অবস্থায় আছে দেখেছিলাম।

ত্রিপুর মন্দির

জলপ্রপাত দেখে বিখ্যাত মার্বেল রকের দিকে যাওয়ার সময় একটা টিলার নিচে থেকে ড্রাইভার বলল, উপরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির আছে, উঠে দেখে আসতে পার। আমরা উঠিনি। জব্বলপুর থেকে বান্ধবগড় দেখে আমরা চলে গেছলাম, অমরকন্টক । অমরকন্টক এর নর্মদা উদগম মন্দির দেখলাম। মন্দিরের থেকে একশ মিটার দূরে কর্ন মন্দির। লাল রঙের বেশ পুরনো কয়েকটা মন্দির। এখন খুব যত্নে বাগান দিয়ে সাজানো। তপোভূমি নর্মদা বইতে ঘোষাল মশাই লিখেছেন, সে সময় ঐ মন্দির জঙ্গলে ঘেরা ছিল।

নর্মদা মন্দির সাদা

এ ছাড়া পাহাড়ের একেবারে মাথায় দেখলাম একটি বিশাল জৈন মন্দির। বিশাল মার্বেল পাথরের তৈরি মন্দিরটি তখনও অসম্পূর্ণ। ফেরার পথে আমাদের গাড়ী আরও গোটা দুই শিব মন্দির ঘুরিয়ে পেনড্রা রোড স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐ শিব মন্দির দুটির একটিতে প্রায় বারো ফুট উচু শিব লিঙ্গের মাথায় জল দেওয়ার জন্য সিঁড়ি করা আছে। ছবি খুঁজে বের করতে গিয়ে দেখি এই শিবের নাম , মহাকালেশ্বর। এই ক'মাস আগে উজ্জয়নি বেড়াতে গিয়ে জানলাম, সেখানকার বিখ্যাত শিবের নাম , মহাকাল।

মহাকালেশ্বর

উজ্জয়িনী তো শুধুই মন্দিরে ঠাসা। একটা আটো নিয়ে এক বেলা ঘুরে ঘুরে পাঁচ সাতটা মন্দির দেখলাম। উজ্জয়িনী, ইন্দোর , ওমকারেশ্বর আর প্রয়াগরাজ ভ্রমণের কথা আগে বিস্তৃত লিখেছি। ইন্দোর শহরের মধ্যে বিরাট অন্নপূর্ণা মন্দির দেখলেও জৈনদের কাঁচ মন্দির খোলা পাইনি। ওমকারেশর এর দুটি বিখ্যাত শিব মন্দির তো দেখলাম। পরদিন সকালে দ্বীপ পরিক্রমা করতে করতে আরও গোটা চার -পাঁচ মন্দির দেখলাম, বাইরে থেকে; সবকটি মন্দিরে ঢুকে দেখা হল না। মহেশ্বরে রাণী অহল্যা বাই এর নিজের পূজার ঘর দেখলাম। সেখানে সোনার সিংহাসনে শিব লিংগ।

অহল্যাবাই এর পুজার ঘর

এছাড়া দুর্গের মধ্যে বিরাট শিব মন্দির ছাড়াও আরও দুটি মন্দির দেখেছি। আমরা যখন প্রয়াগরাজ হয়ে ফিরি সেই সময় সরকারী ভাবে কুম্ভ মেলা শুরু হয়েছে। তার দিন সাতেক আগে প্রধান মন্ত্রী মেলার উদ্বোধন করে গেছেন। আমাদের অবশ্য মেলা নিয়ে সেরকম উৎসাহ ছিল না। আমরা এলাহাবাদ শহরটি ঘুরে দেখতে চেয়েছিলাম। স্টেশন থেকে একটি গাড়ী নিয়ে, শহর দেখতে চাই বলেছিলাম। প্রথমেই আমাদের নিয়ে গেল হনুমান মন্দিরে। বিরাট চত্বরের মধ্যে মন্দির। মন্দির বললে আমরা যেমন বুঝি সেরকম দেখতে নয়। বিশাল নাট মন্দিরের মত। সেখান থেকে গেলাম ভরদ্বাজ আশ্রম। পুরনো আশ্রমের কোন চিহ্নই নেই; শহরের মধ্যে ঝকঝকে মার্বেল পাথরের কয়েকটা ছোট ছোট মন্দির। শহরের মধ্যে সতী মন্দিরটি কিছুটা পুরনো মনে হল। সঙ্গমে স্নান করে ফেরার সময় " শোয়ানো হনুমানের মন্দির" দেখার কথা ছিল; রাস্তা বন্ধ থাকায় দেখা হয়নি।

২০২৪ সালেই একবার বেরিয়ে নৈনিতালের দিকে কয়েকটা জায়গা ঘুরে এলাম। জুন মাসের মাঝামাঝি ওদিকে প্রচণ্ড গরম থাকে, জানা ছিল না। ভীম তাল থেকে রানিক্ষেতের দিকে যাওয়ার পথে পড়ে ওদিককার বিখ্যাত নিব করোরি বাবার কাঁইচি ধাম। ঐ সময় মেলা চলছিল। আমরা জ্যামে আটকা পড়ে গেলাম। তিন চার কিমি রাস্তা পেরোতে ঘন্টা দুই লাগল। ভিড় দেখে আর আশ্রমে ঢোকার চেষ্টা করলাম না। রানিক্ষেতে পৌঁছে প্রথমে গেলাম , ঝুলা দেবী মন্দিরে। মন্দির সাধারণ। সেরকম যাত্রী ও ছিল না। যেটা দেখার মত সেটা হল, বেড়ার গায়ে গায়ে হাজার হাজার পিতলের ঘন্টা ঝোলানো।

ঘন্টার দোকানে বাবার ছবি

দুদিন পর এর প্রায় দশগুণ ঘন্টা দেখলাম, চিতোই গোলু দেবতার মন্দিরে। রাণীক্ষেতে আরও গোটা দুই ছোট ছোট মন্দির দেখেছি। এই চিতোই গোলু দেবতা ঠিক কোন ঠাকুর বোঝা গেল না। খুবই সাধারণ একটি মন্দির। কিন্তু গোটা চত্বর জুড়ে লাখ খানেক ঘন্টা ঝুলছে। ঘন্টার সাথে নিজের নিজের মনোবাসনা লিখে একটি করে চিরকুট। মন্দিরে ঢোকার আগেই রাস্তার পাশে ডালার দোকানের মত শুধুই ঘন্টা বিক্রীর দোকান। বিনসার থেকে কাসার দেবী আসার রাস্তায় আর একটি গোলু দেবতার মন্দিরে ঢুকে দেখে এলাম। যাত্রী প্রায় নেই।

কাসার দেবী মন্দির

কাসার দেবী খুব বিখ্যাত জায়গা। একটি ছোট পাহাড়ের উপর ছোট্ট মন্দির। মূর্তি বেশ ছোট। মন্দিরও বেশ ছোট। ঐ পাহাড়ের নাকি বিরাট কি সব মাহাত্ম আছে। কি সব মহাজাগতিক রশ্মির সমাবেশ হয় ওখানে। ঐ পাহাড়ের উপরে একটি ছোট্ট খোঁদলের মত গুহায় বসে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করেছিলেন। বাঙালি ছাড়া আর

কেউ ওদিক দেখতে যায় বলে মনে হল না। ঐ পাহাড়ের উপর একটি সারদা মঠ আর একটি বৌদ্ধ মনাস্ট্রিও দেখলাম। নৈনিতালের লেকের পাড়ে নয়না দেবী মন্দিরে সবাই পূজা দিচ্ছে দেখলাম। পরদিন সকালে ঘুরতে বেরিয়ে গুরুদ্বোয়ারায় ঢুকলাম। ওখানে ঢোকার সময় মাথায় একটি ফেটটি বেঁধে ঢুকতে হল। এটাই আমাদের প্রথম শিখ ধর্মের মন্দিরে ঢোকার অভিজ্ঞতা। আর মুসলিম মাজারে ঢুকেছিলাম, মুম্বই এর হাজী আলী দরগায়। সমুদ্রের মাঝে সমাধী মন্দির।

পাহাড়ের এক বিখ্যাত সমাধী মন্দির আছে সিকিমে। সে হল বাবা মন্দির। প্রয়াত সৈনিক বাবা হরভজন সিং এর স্মৃতি মন্দিরে ঢুকে দেখে এসেছি। সেদিন বরফ ছিল না, কিন্তু রাস্তা কালো মেঘে ঢেকে গেল। আমার জীবনের সবথেকে পুরনো যে সমাধী মন্দির দেখার কথা মনে পড়ে সেটা আমাদের গ্রামের বাড়ীর পুরোহিত চন্ডি বাবুর সমাধী। ওনাকে আমি চোখে দেখিনি। ওনার সেই ছোট্ট সমাধী মন্দির আমাদের স্কুলে যাওয়ার পথের পাশে দেখতাম। সিমেন্টের সেই মন্দির কি করে একেবারে উধাও হয়ে গেছে জানিনা। শেষ বোধহয় দেখেছি পঞ্চাশ বছর আগে।

বাবা হরভজন সিং

এই মাস দুই আগেই ঘুরে এলাম দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা বিখ্যাত জায়গা। তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আগেই লিখেছি। একবছর আগে আর একবার কোঝিকোর শহরে গেছলাম। সেবারও শুনিনি যে ঐ শহরে থালি মন্দির নামে একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। ওখান থেকে একদিনেই গিয়ে দেখে আসা যায় বিখ্যাত গুরুভায়ুর মন্দির। কিন্তু মন্দির দেখার আগ্রহ ছিল না। একইভাবে সেবার ত্রীবান্দ্রম হয়ে ফিরলেও ঐ শহরের অতি বিখ্যাত পদ্মনাভস্বামী মন্দির দেখার কোন উৎসাহ ছিল না। এবার হঠাৎ করেই, সকালে হাঁটতে বেরিয়ে থালি মন্দির দেখে এলাম। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখা বা পূজা দেওয়ায় চেষ্টা করিনি। কন্যকুমারী তো লোকে যায় বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল দেখতে। আমরাও তাই করলাম। ঐ একই জায়গায় দেবীপাদ মন্দির নামে একটি মন্দির আছে; উঁকি দিয়ে দেখলাম। পরদিন সকালে একটা গাড়ী নিয়ে কন্যাকুমারী ঘুরে নাগের কোয়েল স্টেষণে ফিরলাম। কন্যাকুমারীতেই অন্তত পাঁচটি সুন্দর মন্দির দেখলাম। ফেরার পথে সূচীন্দ্রম মন্দির দেখে নিলাম। এই সুচিন্দ্রম মন্দিরের গোপূরমেই নাকি সবথেকে বেশী মূর্তি আছে।

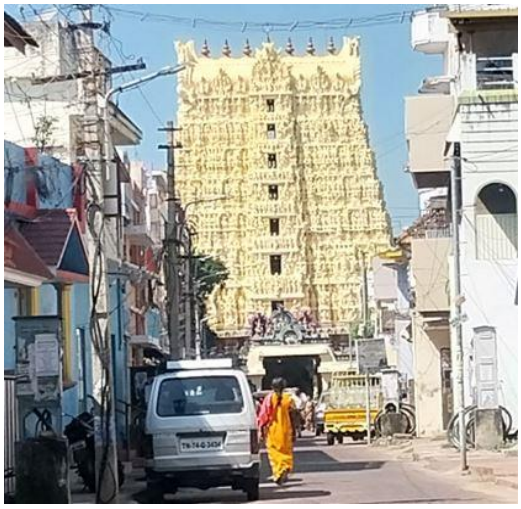
সুচিন্দ্রম মন্দিরের গোপূর

মাদুরাই এর মীনাক্ষী মন্দিরের চারটি গোপুরম পৃথিবী বিখ্যাত। আমরা যখন গেলাম সে সময় ওগুলি চট দিয়ে ঘেরা, মেরামতির কাজ চলছে। ওখান থেকে মাইল দশেক দূরে আলাগিরী পাহাড়ে গোটা তিনেক মন্দির দেখে এলাম। রামেশ্বরম মন্দিরের ভেতরে ঢুকে, বিখ্যাত করিডোরের ছবিও তুলেছি। কিন্তু ওখানকার বাইশ কুন্ডের জলে স্নান করতে যাই নি। আটো নিয়ে ধনুষ্কোডির দিকে যেতে বিভিশনের মন্দির দেখলাম। রামেশ্বরমে গোটা তিনেক কুণ্ড নামের ডোবা পুকুর দেখলাম ।

আর যে দুটি বিখ্যাত মন্দিরে বাঙালি মাত্রই একবার যাবেই তাদের কথা বলে শেষ করা যাক। গয়া গিয়ে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দেওয়া হিন্দুদের পবিত্র কর্তব্য। আমিও দাদাদের সাথে গেলাম। গোটা গয়া শহরটাই অত্যন্ত নোংরা। দেখেই একটা অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। ওখানকার বিষ্ণু মন্দির কেমন দেখেছিলাম, একটুও মনে নেই। ওখান থেকে একটা বড় আটো নিয়ে বুদ্ধ গয়া দেখতে গেছলাম। বুদ্ধ গয়া বেশ পরিস্কার সুন্দর জায়গা। বৌদ্ধ মন্দির আর বুদ্ধ মূর্তি বেশ সুন্দর। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির আশেপাশে বেশ কয়েকটি বড় জলপ্রপাত আছে। আমরাও ঐ জলপ্রপাত দেখতেই গেছলাম। ওদিকের কোন একটা বিখ্যাত দেবী মন্দির লোকে দেখতে যায়। রাজারাপ্পার সেই মন্দির আমাদের দেখা হয়নি। আমাদের ড্রাইভার আমাদের নিয়ে চলল শহরের দক্ষিণ প্রান্তের জগন্নাথ মন্দির দেখাতে। একটা ছোট্ট টিলার উপর এই মন্দির। নতুন হয়েছে। মন্দিরের থেকেও দূরে , নীচে শহরটা দেখতে বেশি সুন্দর লাগে।

সিকিম বেড়াতে গেলে কিছু বৌদ্ধ মোনাষ্ট্রী দেখা হয় ; আমরাও দেখেছি।একটি মোনাষ্ট্রীতে অনেক লামা দেখেছি। কিন্তু দার্জিলিঙের রিশিহাটে যে ফার্মস্টেতে ছিলাম তার অনেকটা উপরে পাহাড়ের মাথায় একটি মনাষ্ট্রী আছে। উঠে দেখে এলাম। কিন্তু কোন মানুষজন দেখলাম না। দার্জিলিং এর ম্যাল থেকে একশ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে একটা মন্দির আছে; শিব মন্দির বোধহয়। আমরা বছর কুড়ি আগে একবার দেখেছি। পশ্চিম সিকিমের নামচি বাজারের কাছে একটা চারধাম তৈরী হচ্ছিল, সে বোধহয় বছর পনের কুড়ি আগে। এতদিনে নিশ্চয়ই পুরো তৈরী হয়ে গেছে।বেনারসে আমি যখন গেছলাম তখনও বিখ্যাত বিশ্বনাথের গলি ছিল। আজকের মত ঝকঝকে করিডোর হয়নি তখনও। বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা মন্দির দেখলাম। ঐ গলির প্রসঙ্গ এলেই আমার এক ডাক্তার দাদার কথা মনে আসবেই। সে এক আলাদা গল্প। এই দাদা অন্নপূর্ণা মন্দির এর সামনের রাস্তায়,

অলৌকিক ভাবে , মা অন্নপূর্ণার প্রাসাদ পেয়েছিলেন। সেবারই সারনাথের বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ইত্যাদী দেখতে গিয়ে অনেক বিদেশী বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রী দেখেছিলাম।

সারনাথ

জম্মু কাশ্মীরের বিখ্যাত বৈষ্ণদেবী মন্দিরে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করিনি। কাটরা ষ্টেশন হয়ে ফেরার সময় দেখেছি, শত শত যাত্রী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্রেনের জন্য চলেছে। এত কষ্ট করে পূণ্য অর্জন করতে পারবো না। আর এই জন্যই তিরুপতি দর্শন করার ইচ্ছাই হয়নি। গুলমার্গে ছোট্ট টিলার উপর একটি কাঠের শিব মন্দির আছে। ওটি একবার পুড়ে গেছল। কোন এক হিন্দি সিনেমার গান ওখানে শ্যুটিং হয়েছিল, তাই খুব বিখ্যাত। দূর থেকে দেখলাম। শ্রীনগরে একটি পাহাড়ের উপর একটি শিব মন্দির দেখতে সবাই যায়, আমরাও গেলাম। চার পাঁচশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

কাশ্মীরের দুটি মন্দির

গোটা দেশ ঘুরে ঘুরে অনেক বিখ্যাত অখ্যাত মন্দির দেখা হল। এবার বাড়ীর কাছে ফিরে আসি। বছর কুড়ি আগে একবার হলদিয়া ঘুরতে গেছলাম। ফেরার পথে মহিষাদল রাজবাড়ীর পুরনো মন্দির দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দির।এই বরগভীমা একটি সতী পীঠ। এ রাজ্যের সবথেকে বিখ্যাত সতী পীঠ হল তারাপীঠ। প্রায় তিরিশ বছর আগে একবার গেছলাম; পূজা দিয়েছিলাম কি না মনে নেই। ঠিক করোনা অতিমারী শুরুর আগে একবার মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গেছলাম। সেবার হাজার দুয়ারী না দেখে অন্য পারে চলে গেছলাম। ঐ পারে আর এক সতী পীঠ, নলাটেশ্বরি মন্দির দেখলাম। ওদিকেই আছে আমাদের গৃহ দেবতা প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম , ডাহাপাড়া ধাম।

ডাহাপাড়া ধাম

বছর কুড়ি আগে একবার সাগরদ্বীপ দেখতে গেছলাম। না, মেলার ভিড়ে যাওয়ার সাহস হয়নি। অন্য সময় দেখে বোঝা মুস্কিল যে মেলার সময় ওখানে কি ভয়ংকর ভিড় হয়। আমরা ওখানে কপিল মুনীর মন্দির দেখেছি। এখন শুনছি সমুদ্র এগিয়ে আসছে। কয়েক বছর পর হয়তো এই মন্দির আর থাকবে না।

মেদিনীপুর শহরে থাকার সময় একবার গেছলাম, কর্নগড়ের মহামায়া মন্দিরে পূজা দিতে। মেদিনীপুরের জগন্নাথ মন্দির বেশ পুরোনো, দেখেছি কয়েকবার ; ভেতরে ঢোকা হয়নি। মেদিনীপুর শহরে কেন্দ্রে বটতলা

চকের কালী মন্দির বেশ বিখ্যাত। এছাড়া হবিবপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরও বেশ বিখ্যাত। উত্তর দিনাজপুর জেলায় চাকরী করার সময় খুব শুনতাম পতিরামের বোল্লা কালী মন্দিরে কথা। কালী পূজার রাত্রে হাজার খানেক বলী হয় শুনেছি। কোনদিন দেখার ইচ্ছাই হয়নি। প্রথম যেদিন ইটাহার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাত্রে ছিলাম, সেই রাত্রেই ছিল কালী পূজা। ভোর থেকে দেখলাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠ পেরিয়ে লোকে চলেছে, খড়ের খাঁচায় বলি দেওয়া পায়রা নিয়ে। রাস্তার অন্য পারে কালী মন্দির দেখতে গেলাম। তখন বলী শেষ হয়েছে। মন্দিরের উঠান রক্তে লাল।

বর্গভীমা মন্দির

আমার বর্তমান জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় আছে বিখ্যাত লোকনাথ বাবার মন্দির। বাড়ীর কাছের দুটি বিখ্যাত মন্দির কয়েকবারই দেখেছি। দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়ের মন্দির। কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি রাস্তা থেকেই দেখা যায়; সেই এগারো বারো ক্লাশে পড়ার সময় ঐ রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতাম। বালিগঞ্জে একটি বিরাট মিন্দির একবার দেখতে ঢুকেছিলাম; কি দেবতার মন্দির মনে নেই। আর কলকাতার মন্দির বললে যে কালী মন্দির বোঝায় সেটা আমার দেখা হয়নি। এখন তো আর ঐ জায়গার সেই স্থান মাহাত্ম নেই। উল্টে ঐ নামটা শুনলে কেমন এক বিতৃষ্ণা হয়। ।আমার বাড়ির থেকে হাঁটা দুরত্বে দমদমের হনুমান মন্দির; কোনোদিন ভেতরে ঢুকে দেখা হয়নি। আর এখন আমার বাড়ীর ঠিকানা বোঝাতে লোককে বলি, বড় কালী বাড়ীর কাছে। একবার একটা গাড়ী নিয়ে চাকলা আর কচুয়া ধাম ঘুরে এলাম। ঐ দিনই যাওয়ার পথে দেখে গেলাম নীলগঞ্জের

নন্দদুলাল মন্দির। এই মন্দিরের কাঁঠাল প্রাসাদ নাকি কোন কোন বড় অসুখ সারিয়ে দেয়। ব্যারাকপুরের বি এন বোস হাসপাতালের কাছেই , গঙ্গার ধারে আছে, অন্নপূর্ণা মন্দির; অনেকটা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মত। কিন্তু বেশ অযত্নে আছে। বারাকপুর স্টেশনের হনুমান মন্দিরে বেশ যাত্রী হয় দেখেছি।

চাকলা ধাম

এরকম মাহাত্ম্য প্রায় সব কটি মন্দিরেরই কিছু না কিছু আছে। আমরা কোন মন্দিরেই কোন অলৌকিক দেখতে যাইনি। মন্দিরের ভাস্কর্য দেখতেই মূলত যাওয়া। অনেক বিখ্যাত মন্দিরেই দেখার মত তেমন বিগ্রহ নেই। এ দেশে ভ্রমণে বের হতে হলে যে দুটি রাজ্য অবশ্যই দেখতে চায় সকলে সেগুলি হল , কাশ্মীর আর আন্দামান। কাশ্মীরে একটি মন্দিরে ঢুকেছি। আন্দামানের যে মন্দির সকল ভারতবাসীর কাছে পবিত্রতম সেটা হল আমাদের মুক্তির মন্দির, সেলুলার জেল। ওটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

সেলুলার জেল

৮.৪.২০২৫.

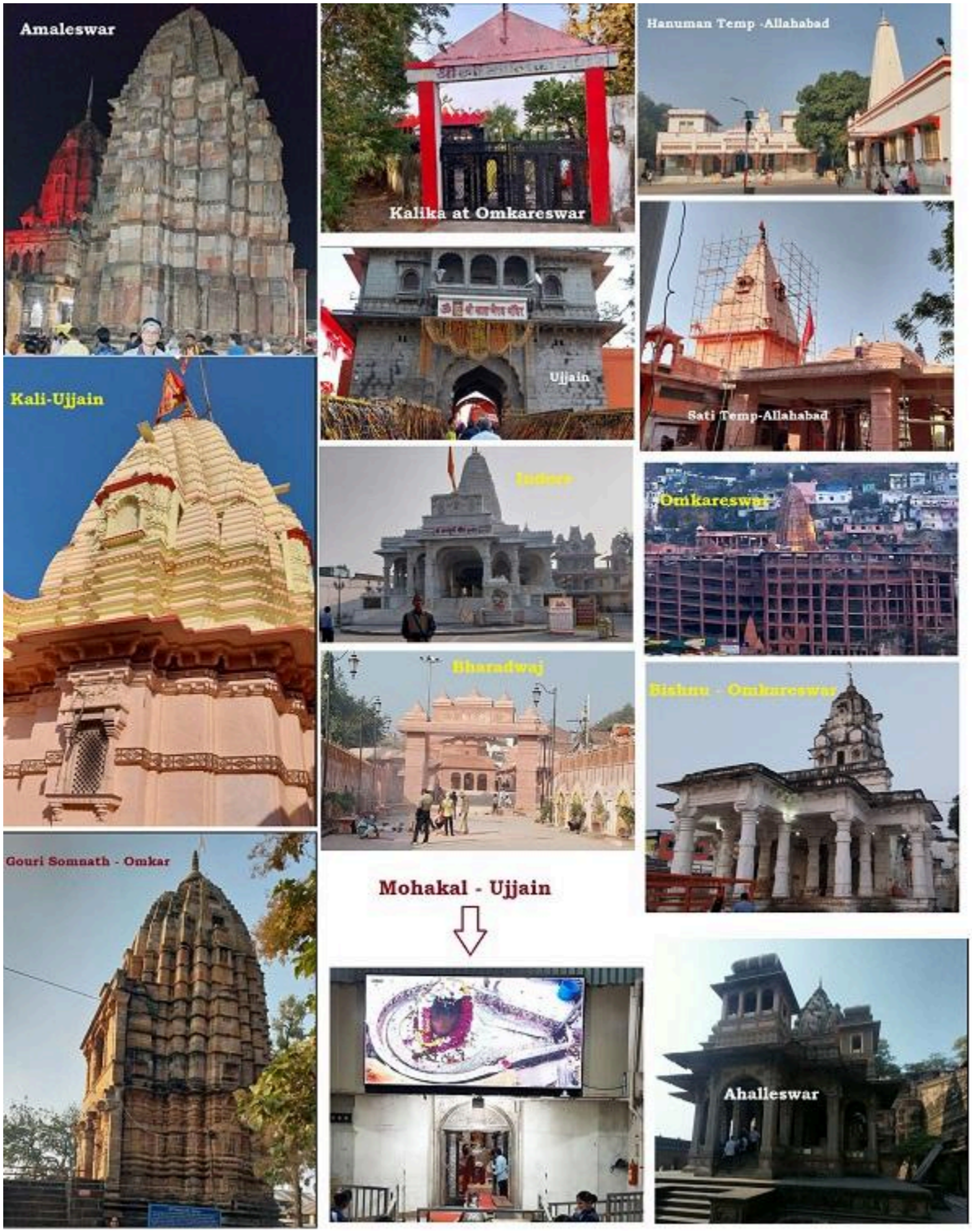

উজ্জয়িনি, ইন্দোর, ওমকারেশ্বর আর মহেশ্বর এর কিছু মন্দির

দক্ষিনের কিছু মন্দির পরের পৃষ্ঠায়

Thali temple

Minakshi E-gate

Bivishon Temp

Parasuram Temp - Moheswar

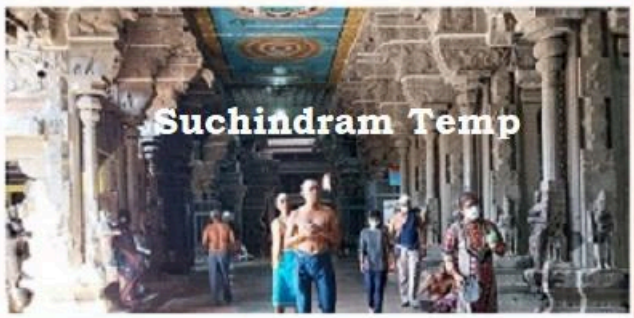
Suchindram Temp

Nataraj Temp-Rameswaram

Debipada Temp, Vivekananda Rock

Ram Kundo - Rameshwaram

Balaji Temp - Kanyakumari

Rameshwaram Corridor

Saibaba Temp -Kanyakumari